রাষ্ট্র

ভি আই লেনিন

স্ভের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতা
১১ জুলাই ১৯১৯

রাষ্ট্র — ভি আই লেনিন

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩১ অক্টোবর, ২০১৯
২য় মুদ্রণ ঃ ২১ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রকাশক ঃ **সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)**
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৪৮ লেনিন সরণি
কলকাতা ৭০০০১৩
০৩৩২২৪৯১৮২৮, ০৩৩২২৬৫৩২৩৪
suci.wb@gmail.com

মুদ্রক ঃ গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ২০ টাকা

প্রকাশকের কথা

ভি আই লেনিন ১৯১৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্ভের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ কমিউনিস্ট কর্মীদের সামনে 'রাষ্ট্র' বিষয়ে যে বক্তব্য রাখেন তা প্রাভদায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮ জানুয়ারি ১৯২৯। ২০১৯-এর ৩১ অক্টোবর এই ভাষণের একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বইটিতে অনুবাদজনিত কিছু অসঙ্গতি নজরে আসায় সেগুলি দূর করে নতুন অনুবাদে ভাষণটি প্রকাশ করা হল। আশা করি, বইটি তরুণ প্রজন্মের বামপন্থী কর্মী সহ সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রের চরিত্র বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাষ্ট্র

ভি আই লেনিন

স্ভের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতা
১১ জুলাই ১৯১৯

কমরেডরা,

আপনারা যে পরিকল্পনার কথা আমাকে জানিয়েছেন, সে অনুসারে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হল রাষ্ট্র। বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের কতখানি পরিচয় আছে জানি না। যতদূর জানি আপনাদের শিক্ষালয় সবে মাত্র খুলেছে এবং নিয়মিত ভাবে এই প্রথম এ বিষয়ে আপনারা আলোচনা করছেন। যদি তাই হয় তবে এই দুরূহ বিষয়ে প্রথম বক্তৃতাতেই আমার বক্তব্য অনেকের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট ও বোধগম্য না হওয়ার বেশ সম্ভাবনা আছে। আর সত্যিই যদি তাই হয় তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ, বিচলিত হবেন না, কারণ রাষ্ট্রের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। বুর্জোয়া পণ্ডিত, লেখক ও দার্শনিকরা আর কোনও প্রশ্নকে সম্ভবত এতটা গুলিয়ে দেননি। সুতরাং প্রথম আলোচনায়, একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা থেকেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার আশা করা উচিত নয়। এ বিষয়ে প্রথম বক্তৃতার পরে, যে সব অংশ বুঝলেন না বা যেগুলি যথেষ্ট পরিষ্কার হল না, সে অংশগুলি টুকে রাখুন, যাতে দু'বার, তিনবার, চারবার সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায়, আর যা বোঝেননি, পড়াশুনা করে এবং নানা বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে তা পরে পরিষ্কার ও বিশদভাবে বুঝে নিতে হবে। আশা করি আমরা আরও একবার এক সাথে বসার ব্যবস্থা করতে পারব। তখন এ সংক্রান্ত আরও নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যাবে আর দেখা যাবে কোন অংশটা সবচেয়ে কম বুঝেছেন। আশা করি এই সব আলোচনা ও বক্তৃতা শোনা ছাড়াও মার্ক্স ও এঙ্গেলসের অন্ততঃপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বই পড়ার জন্যও আপনারা কিছুটা সময় দেবেন। সোভিয়েত ও পার্টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাঠাগারে, আপনাদেরও সে পাঠাগার আছে, সূচি ও গ্রন্থপঞ্জীতে নিশ্চয়ই এই সব গুরুত্বপূর্ণ বই পাবেন। প্রথমে হয়ত সেই বইগুলির ব্যাখ্যাও কারও কারও কঠিন লাগতে পারে। কিন্তু আবার বলি, তাতে বিচলিত হবেন না। একবার পড়ায় যা অস্পষ্ট থেকে গেল, দ্বিতীয়বার পড়লে বা পরে প্রশ্নটাকে কিছুটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করলে তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কারণ, আবারও বলছি, প্রশ্নটা এত জটিল এবং বুর্জোয়া পণ্ডিত ও লেখকরা তাকে এত গুলিয়েছেন যে, যদি কেউ এ বিষয়টিকে সত্যিসত্যিই হৃদয়ঙ্গম করতে চায় এবং নিজে নিজেই তাকে আয়ত্তে

আনতে চায়, তা হলে পরিষ্কার ও পুরোপুরিভাবে বোঝার জন্য তাকে বারবার এটি নিয়ে চর্চা করতে হবে, বারবার ফিরে আসতে হবে তাতে এবং নানা দিক থেকে আলোচনা করে দেখতে হবে। এ প্রশ্নটিতে ফিরে আসা আরও সহজ হবে এই জন্য যে, সমস্ত রাজনীতির গোড়ার তথা মূল প্রশ্ন এটি এবং শুধু আজকের মতো ঝোড়ো এবং বিপ্লবের যুগেই নয়, অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেও, যে কোনও অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্নের সূত্রেই আপনারা খবরের কাগজে প্রতিদিন এই প্রশ্নটি দেখবেন। প্রতিদিন, কোনও না কোনও ভাবে আপনারা এই প্রশ্নে ফিরে আসবেন যে, রাষ্ট্র কী, রাষ্ট্রের মর্মবস্তু কী, রাষ্ট্রের তাৎপর্য কী এবং আমাদের পার্টি, যে পার্টি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের জন্য লড়াই চালাচ্ছে সেই কমিউনিস্ট পার্টির এ বিষয়ে মনোভাব কী? মূল কথা হল, রাষ্ট্র বিষয়ে পড়াশুনা, আলোচনা ও বক্তৃতা শোনার পরে আপনাদের বিষয়টি নিয়ে স্বাধীন ভাবে বক্তব্য রাখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারা উচিত, কারণ নানা ধরনের পরিস্থিতিতে, সব রকম খুঁটিনাটি প্রশ্নে, সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত অবস্থায় এবং প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনা ও বিতর্কের সময় এই প্রশ্নটি আপনাদের সামনে উঠবে। যখন স্বাধীনভাবে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে শিখবেন একমাত্র তখনই মনে করতে পারেন যে, আপনাদের মতামতের যথেষ্ট দৃঢ়তা জন্মেছে এবং যে কোনও সময়ে, যে কোনও লোকের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাফল্যের সাথে আপনাদের মতামতের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারেন।

সংক্ষেপে এই ক'টি কথা বলে আমি এ বার আসল প্রশ্নটিতে আসব। রাষ্ট্র কী, কী ভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হল এবং শ্রমিক শ্রেণির পার্টি— যে পার্টি পুঁজিবাদ পুরোপুরি উচ্ছেদ করার জন্য লড়ছে, সেই কমিউনিস্ট পার্টির রাষ্ট্র সম্পর্কে মূলত কী মনোভাব হওয়া উচিত— এ বিষয়ে আলোচনায় ঢুকব।

আগেই বলেছি যে, বুর্জোয়া বিজ্ঞান, দর্শন, আইনশাস্ত্র, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র এবং সাংবাদিকতার মুখপাত্ররা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নটিতে যত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন, তেমন বোধহয় আর কোনও প্রশ্নের বেলায় করেননি। আজও এ প্রশ্নটিকে প্রায়ই ধর্মের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়। শুধু ধর্মমতের মুখপাত্ররাই নন (তাঁদের কাছ থেকে তো এটা আশা করাই স্বাভাবিক), যে সব লোক নিজেদের ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত বলে মনে করেন, তাঁরাও প্রায়ই রাষ্ট্রের বিশেষ প্রশ্নটি ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। তাঁরা এমন একটি মতবাদ খাড়া করতে চেষ্টা করেন যা বেশির ভাগ সময়েই হয়ে দাঁড়ায় মতাদর্শ ও দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিধারার দিক থেকে অত্যন্ত জটিল। এর মূল কথা, রাষ্ট্র হল একটা স্বর্গীয়, অপার্থিব বিষয়। রাষ্ট্র এমন একটা শক্তি যার জোরে মানুষ বেঁচে আছে। এই শক্তি মানুষকে দেয় বা দিতে পারে এমন কিছু যা মানুষের কাছ থেকে পাওয়া নয়, বাইরে থেকে পাওয়া। রাষ্ট্র হল এক ঐশ্বরিক শক্তি। এবং এটা বলতেই হচ্ছে যে, এই মতবাদ শোষক শ্রেণির— জমিদার, পুঁজিপতির স্বার্থের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, এই মতবাদ তাদের স্বার্থ রক্ষায় এত বেশি সাহায্য করে, বুর্জোয়া শ্রেণির

মুখপাত্র ভদ্র-মহোদয়দের রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানের সাথে এই মতবাদ এত গভীর ভাবে জড়িয়ে গেছে যে, সর্বত্রই আপনারা এর চিহ্ন দেখতে পাবেন। এমনকি যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনারিরা চরম বিতৃষ্ণার সাথে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা ধর্মীয় সংস্কারের দ্বারা মোটেই আচ্ছন্ন নন এবং রাষ্ট্রের প্রশ্নকে প্রসন্ন মনে বিচার করতে সক্ষম, রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁদের মতামতেও এ মতবাদের চিহ্ন দেখতে পাবেন। রাষ্ট্র প্রশ্নটিকে এত গুলিয়ে দেওয়া ও জটিল করে তোলার কারণ হল অন্যান্য প্রশ্নের চেয়ে এই প্রশ্নটির সঙ্গেই শাসক শ্রেণির স্বার্থ সবচেয়ে বেশি জড়িত (এই প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বের কথা বাদ দিলে)। রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগকে ন্যায্যতা দেয়, শোষণ টিকে থাকাকে যৌক্তিকতা দেয়, পুঁজিবাদের টিকে থাকাকে সঠিক প্রতিপন্ন করে। সেই জন্যই এ প্রশ্নে নিরপেক্ষতা আশা করা, এমনকি যাঁরা নিজেদের বিজ্ঞানমনস্ক বলে দাবি করেন তাঁদের কাছ থেকেও এ বিষয়ে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আশা করা হবে সবচেয়ে বড় ভুল। রাষ্ট্রের প্রশ্নটির সাথে যথেষ্ট পরিচয় হলে, রাষ্ট্র বিষয়ক মতবাদ, রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্ব যত গভীর ভাবে আলোচনা করবেন, ততই আপনাদের নজরে পড়বে এর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির পারস্পরিক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম প্রতিফলিত হয় বা ফুটে ওঠে রাষ্ট্র সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির, রাষ্ট্রের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিচারের পার্থক্যে।

যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ প্রশ্নটি আলোচনা করতে হলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের উপর একবার অন্তত চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। খুঁটিনাটি বিষয়ে বা পরস্পরবিরোধী অসংখ্য মতামতের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক ভাবে প্রশ্নটিকে আলোচনা করার অভ্যাসের জন্য, প্রশ্নটিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা করার পক্ষে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক যোগসূত্রটি না ভোলা, কেমন করে ইতিহাসে আলোচ্য ঘটনাটির উদ্ভব ঘটল, এবং বিকাশের পথে প্রধান প্রধান কোন পর্যায় তা পার হয়ে এল, সেই দিক থেকে প্রতিটি সমস্যা বিচার করা, আলোচ্য বিষয়টির বর্তমান পরিণতি কী, সেটা তার বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা।

আশা করি, রাষ্ট্র প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে আপনারা এঙ্গেলসের লেখা ‘পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি’ বইটি পড়বেন। এটি আধুনিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অন্যতম একটি মৌলিক রচনা, যার প্রত্যেকটি বাক্য নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায়। কারণ নিশ্চিত রূপে এতে খেয়ালখুশি মতো কথা বলা হয়নি, বিপুল ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তথ্যের ভিত্তিতেই প্রত্যেকটি কথা লেখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বইটির সমস্ত অংশ একই রকম সহজ বা বোধগম্য নয়। কিছু কিছু অংশ বুঝতে হলে ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে পাঠকের আগেই কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু আমি আবারও বলছি, বইটি পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও বিচলিত হবেন না। খুব কম লোকই তা পারে। কিন্তু এ বিষয়ে উৎসাহ

জেগে গেলে আবার যখন বইটি পড়বেন তখন দেখবেন যে, এর বেশির ভাগটাই— পুরোটা যদি না-ও হয়— বুঝতে পারছেন। এই বইটির কথা আমি উল্লেখ করছি, কারণ তা আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। বইটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের ঐতিহাসিক রেখাচিত্র দিয়ে শুরু হয়েছে।

পুঁজিবাদের উৎপত্তি, মানুষের উপর মানুষের শোষণ, সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি কী ভাবে হল, কোন পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হল ইত্যাদি সব প্রশ্নের মতো রাষ্ট্রের প্রশ্নটির সঠিক ও নির্ভরযোগ্য আলোচনার পথ হল সামগ্রিক ভাবে তার বিকাশের ইতিহাসের উপর দৃষ্টিপাত করা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্র চিরকাল ছিল না। একটা সময় ছিল যখন কোনও রাষ্ট্র ছিল না। যখন এবং যেখানেই সমাজে শ্রেণিবিভাগ দেখা দেয়, যখনই শোষক ও শোষিত দেখা দেয়, তখনই সেখানে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের প্রথম রূপ— দাসপ্রভু ও দাস। এই শ্রেণি বিভাজন আসার আগে ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, যাকে অনেক সময় গোষ্ঠী পরিবার বলা হয় (গোষ্ঠী বা ক্ল্যান ঃ পারিবারিক গোষ্ঠী, যখন মানুষ আত্মীয়তা বা কুল অনুসারে একসঙ্গে বসবাস করত)। অনেক আদিম জাতির জীবনে এই আদিম যুগের যথেষ্ট ছাপ রয়ে গেছে। এবং আদিম সংস্কৃতি বিষয়ে যে কোনও বই থেকে এ বিষয়ে মোটামুটি স্পষ্ট বর্ণনা, উল্লেখ এবং এই বিবরণ পাবেন যে, মোটামুটি আদিম সাম্যবাদী ধরনের এমন একটা সময় ছিল যখন সমাজ দাস ও দাসমালিকে বিভক্ত ছিল না। সেই সময়ে কোনও রাষ্ট্র ছিল না, নিয়মিত বলপ্রয়োগ করার ও বলপ্রয়োগ করে মানুষকে পদানত রাখার কোনও বিশেষ যন্ত্র ছিল না। এই রকমের যন্ত্রকেই রাষ্ট্র বলা হয়।

আদিম সমাজে, মানুষ যখন ছোট ছোট পারিবারিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত এবং যখন তারা বিকাশের নিম্নতম ধাপে, প্রায় বন্য অবস্থায় ছিল— যে যুগটা ছিল আধুনিক সভ্য মানবসমাজের থেকে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে— সেখানে তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমরা সেই সময় দেখতে পাই রীতিনীতির প্রাধান্য, কর্তৃত্ব, শ্রদ্ধা, গোষ্ঠীর প্রবীণদের হাতে ক্ষমতা। আমরা দেখি, কখনও কখনও সে ক্ষমতা নারীদের হাতেও ন্যস্ত হত— সেই সময়ে নারীরা আজকের মতো পদানত, উৎপীড়িত অবস্থায় ছিল না। কিন্তু কোথাওই আমরা এমন বিশেষ একদল লোক দেখতে পাই না, অন্যদের শাসন করার জন্য এবং শাসন চালানোর স্বার্থে ও উদ্দেশ্যে, সুসংগঠিত ও স্থায়ী ভাবে বলপ্রয়োগের একটি নির্দিষ্ট যন্ত্র, হিংস্রতার একটি যন্ত্র চালনা করার জন্য যাদের আলাদা করা হয়েছে। আজকের দিনে আপনারা সবাই বোঝেন যে, সেই যন্ত্র হল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী, কারাগার এবং গায়ের জোরে অন্যের ইচ্ছাকে দমন করার আরও নানা উপায়— এ সবই হল রাষ্ট্রের আসল মর্মবস্তু।

তথাকথিত ধর্মশিক্ষা, তার নানা সূক্ষ্ম বিষয়, দার্শনিক যুক্তিধারা এবং বুর্জোয়া

পণ্ডিতদের নানা রকমের মতামতের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা আসল বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করি, তা হলে দেখব যে, রাষ্ট্র সত্যিই এমন এক শাসন-যন্ত্র যা মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। যখন এমন এক বিশেষ ধরনের লোক দেখা দেয় যাদের একমাত্র কাজ শাসন চালানো এবং সেই কাজের জন্য তাদের প্রয়োজন হয় বলপ্রয়োগের ও জোর করে অন্যদের ইচ্ছাকে আয়ত্তে আনার বিশেষ যন্ত্রের— কারাগার, বিশেষ বাহিনী, সৈন্যদল ইত্যাদির, তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন কোনও রাষ্ট্র ছিল না, যখন সাধারণ সম্পর্ক, খোদ সমাজ, শৃঙ্খলা এবং কাজের বিন্যাস প্রথা ও রীতি ও ঐতিহ্যের শক্তির মাধ্যমে, অথবা গোষ্ঠীর প্রবীণ বা মহিলাদের কর্তৃত্ব বা সম্মানের মাধ্যমে বজায় থাকত। সে যুগে মেয়েরা প্রায়ই পুরুষের সমান মর্যাদা উপভোগ করত শুধু তাই নয়, অনেক সময় তাদের মর্যাদা ছিল বেশি। তখন শাসন-বিশেষজ্ঞ হিসাবে সমাজে কোনও বিশেষ শ্রেণির মানুষ ছিল না। ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই এবং যেখানেই সমাজে শ্রেণিবিভাগ দেখা দিল, অর্থাৎ সমাজ এমন কয়েকটি দলে বিভক্ত হল যাদের মধ্যে একদল চিরকাল অন্যদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করছে, অন্যদের শোষণ করছে, তখনই আর সেখানেই মানুষের প্রতি বলপ্রয়োগের বিশেষ যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র দেখা দিল।

এ কথা সব সময় সুস্পষ্ট ভাবে মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন শ্রেণিতে সমাজের এই বিভাজন ইতিহাসের একটি মৌলিক ঘটনা। হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্যেকটি দেশে সমস্ত মানব সমাজের ক্রমবিকাশে ব্যতিক্রমহীন ভাবে একটা সাধারণ নিয়ম, একটা নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ধারাবাহিকতা দেখা যায়, সেটা হল, প্রথমে আমাদের সমাজটা ছিল শ্রেণিহীন— গোড়ার আদিম পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, যেখানে কোনও অভিজাত শ্রেণি ছিল না। তারপর এল দাস প্রথাকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সমাজ— দাসমালিকদের সমাজ। সমগ্র আধুনিক সভ্য ইউরোপই এই স্তরের মধ্য দিয়ে গেছে। দু'হাজার বছর আগে দাস প্রথারই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বেশির ভাগ জাতিও এই স্তরের মধ্য দিয়ে গেছে। কম উন্নত জাতিগুলির মধ্যে আজও পর্যন্ত দাস প্রথার রেশ রয়ে গেছে। যেমন, আফ্রিকাতে এখনও দাস প্রথা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়। দাসমালিক ও দাস— এটাই ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি বিভাজন। উৎপাদনের উপায়গুলির— জমি এবং উৎপাদনে যুক্ত যন্ত্রপাতি, তা সেগুলি যত অনুন্নত প্রকৃতিরই হোক না কেন— দাসমালিকরা যে শুধু সে সবেরই মালিক ছিল তাই নয়, তারা দাসদেরও মালিক ছিল। এই দলকে বলা হত দাসমালিক, আর যারা শ্রম দিত এবং তা দিত অন্যদের জন্য, তাদের বলা হত দাস।

এই স্তরের পর ইতিহাসে দেখা যায় আরেকটি স্তর— সামন্ততন্ত্র। বেশির ভাগ দেশেই ক্রমবিকাশের ধারায় দাস প্রথা ভূমিদাস প্রথায় পরিণত হয়। সমাজে তখন মূল দুটি বিভাগ— সামন্তী জমিদার ও ভূমিদাস কৃষক। মানুষে মানুষে সম্পর্কের

ধরনও বদলে যায়। দাসমালিকরা দাসদের নিজের সম্পত্তি বলে মনে করত। আইনও এই মতকে পুরোপুরি সমর্থন করত এবং আইনের চোখে দাসরা ছিল পুরোপুরি দাসমালিকদের অস্থাবর সম্পত্তি। ভূমিদাসদের বেলাতে শ্রেণি-উৎপীড়ন ও অধীনতা রয়ে গেল, কিন্তু ভূমিদাসরা জমিদারদের অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে আর গণ্য হল না। জমিদারদের কেবল ভূমিদাসদের শ্রমের উপর অধিকার ছিল এবং কতকগুলি বিশেষ ধরনের কাজ করতে জমিদার ভূমিদাসদের বাধ্য করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে আপনারা জানেন, বিশেষ করে রাশিয়াতে যেখানে ভূমিদাসত্ব সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং সবচেয়ে কুৎসিত চেহারা নিয়েছিল, সেখানে ভূমিদাসত্ব ও দাসপ্রথার মধ্যে কার্যত কোনও পার্থক্য ছিল না।

আরও পরে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও টাকাপয়সার লেনদেন বেড়ে ওঠা এবং পৃথিবীব্যাপী বাজার গড়ে ওঠার সাথে সাথে সামন্তী সমাজের মধ্যেই এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব হল। সেটি হল পুঁজিপতি শ্রেণি। দ্রব্যের পণ্যে পরিণত হওয়া, পণ্যদ্রব্যের বিনিময় ও টাকার ক্ষমতাবৃদ্ধি থেকে পুঁজির শক্তির উদ্ভব হল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে— বরং বলা ভাল, আঠেরো শতকের শেষভাগে এবং উনিশ শতকে বিশ্বের দেশে দেশে বিপ্লব ঘটে যায়। পশ্চিম ইউরোপের সব দেশ থেকে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে। সবার শেষে তা ঘটে রাশিয়াতে। ১৮৬১ সালে রাশিয়াতেও একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়, যার ফলে এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার জায়গায় এল আর এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা— সামন্ততন্ত্রের জায়গায় আসে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদেও শ্রেণিবিভাগ রইল, রয়ে গেল ভূমিদাসত্বের নানা রেশ ও জের। কিন্তু শ্রেণিবিভাগ মৌলিক ভাবে এক নতুন রূপ নিল।

সব পুঁজিবাদী দেশেই পুঁজির মালিক, জমির মালিক, কলকারখানার মালিকরা সে দিনও ছিল জনসংখ্যার একটি নগণ্য অংশ, আজও তাই আছে। সমস্ত জনসাধারণের শ্রমের উপর তাদের অখণ্ড আধিপত্য, তাই তারা সমস্ত মেহনতি মানুষের উপর প্রভুত্ব করে, তাদের উপর উৎপীড়ন চালায় ও শোষণ করে। এই মেহনতিদের অধিকাংশই হল সর্বহারা, মজুরি-খাটা শ্রমিক, যারা শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি, নিজেদের কর্মপটু হাত দুটি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বেচেই জীবনধারণের উপকরণগুলি সংগ্রহ করতে পারে। সমাজের পুঁজিবাদে উত্তরণের পর, সামন্তী সমাজে যে কৃষকরা অসংগঠিত ও নিপীড়িত ছিল, তাদের বেশিরভাগ অংশ সর্বহারায় পরিণত হল। এবং ছোট অংশটি ধনী কৃষক হয়ে দাঁড়াল, যারা নিজেরাই মজুর খাটাত। এরাই তৈরি করেছিল গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণি।

দাসত্বের আদিম ধরন থেকে ভূমিদাসত্বে ও পরে সমাজের পুঁজিবাদে রূপান্তর— এই মূল ঘটনাটি সব সময়ে মনে রাখতে হবে। কারণ শুধুমাত্র এই মূল বিষয়টি মনে রেখেই, সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদকে শুধু এই মূল কাঠামোতে ফেলেই সেগুলিকে সঠিক ভাবে যাচাই করা যাবে, সেগুলোর বক্তব্য ঠিক মতো বোঝা যাবে। কারণ দাসত্ব, ভূমিদাসত্ব ও পুঁজিবাদ— মানুষের ইতিহাসের এই সব বিরাট

পর্যায়ের প্রত্যেকটি, এত শত শত হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থেকেছে এবং এর মধ্যে এত রকমের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এত নানা ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ, মতামত ও বিপ্লব দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র সমাজের শ্রেণি বিভাগকে, শ্রেণি শাসনের ধরনে এই পরিবর্তনগুলিকে মূল সূত্র হিসাবে ধরে নিয়ে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সমস্ত সামাজিক প্রশ্ন, বিশেষত বুর্জোয়া পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য মতবাদগুলিকে বিচার করলে তবেই সেগুলির বিরাট বৈচিত্র্য ও ধরনকে বোঝা সম্ভব।

সমাজের এই মৌলিক বিভাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি রাষ্ট্রকে দেখেন, তা হলে দেখবেন— আমি আগে যেমন বলেছি— সমাজে শ্রেণি বিভাগ দেখা দেওয়ার আগে রাষ্ট্রের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু যখন শ্রেণির ভিত্তিতে সমাজে বিভাজন দেখা দিল এবং সেই বিভাজন পাকাপোক্ত রূপ নিল, শ্রেণি-সমাজের উদ্ভব হল— তখনই রাষ্ট্রেরও উদ্ভব হল ও তা শিকড় গেড়ে বসল। মানুষের ইতিহাসে এমন শত শত দেশ দেখা যায় যা দাসত্ব, ভূমিদাসত্ব ও পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এই সব দেশের প্রত্যেকটিতেই বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, দাসত্ব থেকে ভূমিদাসত্বের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদে এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আজকের দুনিয়াজোড়া সংগ্রামে মানবজাতির এই ক্রমবিকাশের সাথে জড়িত সব রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও বিপ্লব সত্ত্বেও সব সময়েই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আপনাদের চোখে পড়বে। বরাবরই রাষ্ট্র হল সম্পূর্ণ ভাবে বা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে বা প্রধানত শাসনকার্যে নিযুক্ত একদল লোককে নিয়ে গঠিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি যন্ত্র। মানুষ ভাগ হয়ে গেল দুটো ভাগে— শাসিত এবং শাসক। শাসন বিশেষজ্ঞ কিছু লোক যারা সমাজের ঊর্ধ্বে উঠে গেল, তাদের বলা হল শাসক, তারা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। এই যে রাষ্ট্রযন্ত্র, এই যে এক দল লোক যারা অন্যদের শাসন করছে— এদের হাতে সব সময়েই দমনের, শারীরিক বল প্রয়োগের একটি বিশেষ যন্ত্র থাকে। মানুষের উপর বলপ্রয়োগের সেই যন্ত্র, তা সে আদিম যুগের মুগুরই হোক, বা দাস যুগে আরও একটু উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রই হোক, বা মধ্যযুগের আগ্নেয়াস্ত্রই হোক, অথবা বিংশ শতাব্দীর আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক ও আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি আধুনিক অস্ত্রই হোক। বলপ্রয়োগের ধরন পাল্টেছে। কিন্তু রাষ্ট্র থাকলেই সেখানে প্রত্যেক সমাজে এমন এক দল লোক থাকবে যারা শাসন করছে, হুকুম করছে, প্রভুত্ব করছে এবং নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে শারীরিক নিপীড়নের জন্য, জবরদস্তির জন্য যাদের হাতে আছে সেই সেই সময়কার সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র। এই সাধারণ ঘটনাগুলিকে পরীক্ষা করে, নিজেদের যদি জিজ্ঞাসা করি— যখন সমাজে কোনও শ্রেণি ছিল না, কোনও শোষক এবং শোষিত ছিল না, তখন কোনও রাষ্ট্রও ছিল না কেন, আর শ্রেণি জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রও দেখা দিল কেন— তবেই, এবং একমাত্র শুধু এই ভাবেই রাষ্ট্রের মর্মবস্তু ও তার যথাযথ তাৎপর্য

আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

রাষ্ট্র হল একটি শ্রেণির উপর অন্য একটি শ্রেণির আধিপত্য কায়েম রাখার যন্ত্র। যখন সমাজে কোনও শ্রেণি ছিল না, যখন দাসত্বের যুগের আগে মানুষকে খাটতে হত অধিকতর সমতার আদিম অবস্থায়, যখন শ্রমের উৎপাদনশীলতা ছিল নিম্নতম স্তরে, আর আদিম মানুষকে যখন অত্যন্ত আদিম ধরনের জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতেও খুব বেগ পেতে হত— তখনও পর্যন্ত সমাজের উপর শাসন ও আধিপত্য চালানোর জন্য বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করা কোনও একদল লোকের উদ্ভব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। শুধুমাত্র যখন সমাজে শ্রেণি বিভাজন প্রথম দেখা দিল, যখন দাস প্রথা দেখা দিল, যখন একেবারে প্রাথমিক ধরনের কৃষিকাজের উপরে ভর করে একটি বিশেষ শ্রেণি কিছু বাড়তি উৎপাদন করতে পারল, যখন দাসদের অত্যন্ত হীন জীবনধারণের জন্যও এই উদ্বৃত্ত আর একান্ত প্রয়োজনীয় থাকল না এবং সে উদ্বৃত্ত দাসমালিকদের হাতে গেল, যখন এই ভাবে দাসমালিক শ্রেণির অস্তিত্ব বেশ শিকড় গেড়ে বসল, তখন তাদের অস্তিত্ব পাকাপোক্ত করার জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব নিতান্ত দরকার হয়ে পড়ল।

এবং সত্যিই রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। উদ্ভব হল দাসমালিক রাষ্ট্রের। এই রাষ্ট্রযন্ত্র দাস-মালিকদের হাতে ক্ষমতা দিল এবং দাসদের উপর শাসন চালাবার মতো শক্তিধর করে তুলল তাদের। সমাজ ও রাষ্ট্র দুই-ই সেই সময়ে আজকের দিনের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র ছিল। সেই রাষ্ট্রের হাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল আজকের তুলনায় নগণ্য। আধুনিক যুগের যোগাযোগ মাধ্যমের অস্তিত্বই তখন ছিল না। আজকের দিনের তুলনায় পাহাড়, নদী ও সমুদ্র তখন ছিল দুর্লঙ্ঘ বাধা। ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠত অনেক সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে। প্রযুক্তিগত ভাবে দুর্বল রাষ্ট্রযন্ত্র তুলনামূলক ভাবে ছোট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রে তার ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপ চালাত। তা সত্ত্বেও একটা যন্ত্র অবশ্যই ছিল যা দাসদের দাসত্বে আটকে থাকতে বাধ্য করত, সমাজের একটা অংশকে অন্য অংশের কাছে পদানত ও নিপীড়িত করে রাখত।বলপ্রয়োগের একটি স্থায়ী যন্ত্র ছাড়া সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অন্য অংশটির জন্য নিয়মিতভাবে খাটতে বাধ্য করা যায় না। যত দিন কোনও শ্রেণি ছিল না, তত দিন এ রকম কোনও যন্ত্রও ছিল না। যখন শ্রেণির উদ্ভব হল এবং সর্বত্র সেই বিভাজন বাড়তে ও কায়েম হতে লাগল, তখনই উদ্ভব হল একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের। সেই প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের রূপগুলি ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। দাসপ্রথার যুগেই রাষ্ট্রের নানা রূপ দেখা গেছে। তখনকার বিচারে সবচেয়ে অগ্রণী, সংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্য দেশ— যেমন প্রাচীন গ্রিস ও রোমে রাষ্ট্র ছিল পুরোপুরি দাসশ্রমনির্ভর। সেই যুগেই রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। রাজতন্ত্রে ক্ষমতা একটিমাত্র লোকের হাতে থাকে। প্রজাতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া কারও হাতে শাসনক্ষমতা থাকে না। অভিজাততন্ত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের হাতে ক্ষমতা থাকে। গণতন্ত্র হল জনগণের ক্ষমতা (গ্রিক

ভাষায় ডেমোক্রেসি শব্দটার মানেই হল জনগণের ক্ষমতা)। দাসপ্রথার যুগেই এই সব ভিন্নতার উদ্ভব হয়েছিল। নানা রূপভেদ সত্ত্বেও দাস-মালিকানার যুগে রাষ্ট্র ছিল দাসমালিক রাষ্ট্র, তা সে রাজতন্ত্রই হোক বা অভিজাততান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই হোক।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস সংক্রান্ত যে কোনও পাঠ্যক্রমে যখনই কোনও বক্তৃতা শুনবেন, সেখানে রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিরোধের কথা শুনবেন। কিন্তু মূল কথাটা হল— দাসদের মানুষ বলে গণ্যই করা হত না। তাদের শুধু নাগরিক বলে গণ্য করা হত না তাই নয়, তাদের মানুষ বলেই মনে করা হত না। রোমান আইন অনুসারে তারা অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অন্য সব আইনের কথা ছেড়েই দিলাম, নরহত্যার আইনও দাসদের বেলায় খাটত না। শুধুমাত্র দাসমালিকদেরই রক্ষা করত এ আইন। শুধু তাদেরই পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত নাগরিক বলে মনে করা হত। কিন্তু রাজতন্ত্রই হোক বা প্রজাতন্ত্র— তা ছিল দাসমালিকদের রাজতন্ত্র অথবা দাসমালিকদের প্রজাতন্ত্র। সে সব রাষ্ট্রে সমস্ত অধিকার ছিল দাসমালিকদের হাতে, আর আইনের চোখে দাস ছিল অস্থাবর সম্পত্তি। দাসের উপর যে কোনও ধরনের অত্যাচার তো করা যেতই, তাকে খুন করাটাও অপরাধ বলে গণ্য হত না। দাসমালিক প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ গঠন নানা রকম হত— অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছিল, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও ছিল। অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত অল্প কয়েকজন লোক নির্বাচনে অংশ নিত। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সবাই নির্বাচনে অংশ নিত। কিন্তু সবাই মানে শুধু দাসমালিকরা, দাসরা বাদে প্রত্যেকে। এই মূল কথাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কারণ এই তথ্যটিই রাষ্ট্রের প্রশ্নে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি আলোকপাত করে আর সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলে।

রাষ্ট্র হল একটি শ্রেণির উপর অন্য একটি শ্রেণির উৎপীড়নের যন্ত্র, অন্য অধীনস্থ শ্রেণিগুলিকে একটি শ্রেণির অনুগত করে রাখার যন্ত্র। এই যন্ত্রের ধরন নানা রকম। দাসমালিক রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র, অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, এমনকি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও ছিল। আসলে শাসক সরকারের ধরনে অনেক পার্থক্য দেখা গেছে, কিন্তু সেগুলির সারবস্তু একই থেকেছে। তা হল, দাসদের কোনও অধিকার ছিল না, তারা ছিল নিপীড়িত শ্রেণি, তাদের মানুষ বলে গণ্য করা হত না। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রেও আমরা একই জিনিস দেখি।

শোষণের ধরন বদলে যাওয়ার কারণে দাসমালিক রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ ঘটনার গুরুত্ব বিপুল। দাসপ্রথার যুগের সমাজে দাসদের কোনও অধিকারই ছিল না, তাদের মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক ছিল জমির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ভূমিদাসত্বের মূল লক্ষণ ছিল এই যে, কৃষকদের (আর সে যুগে কৃষকই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শহরের লোক ছিল খুবই কম) মাটির সঙ্গে বাঁধা বলে মনে করা হত— ভূমিদাসত্ব ধারণাটা এসেছে এর থেকেই। জমিদার

কৃষককে যে জমি দিত সেখানে নির্দিষ্ট কয়েকটা দিন কৃষক নিজের জন্য কাজ করতে পারত। বাকি দিনগুলিতে কৃষক-ভূমিদাসকে খাটতে হত তার মালিকের জন্য। শ্রেণি-সমাজের সারবস্তুটি রয়ে গেল— সমাজের ভিত্তি হয়ে রইল শ্রেণি শোষণ। একমাত্র জমিদাররাই পূর্ণ অধিকার ভোগ করতে পারত, কৃষকদের কোনও অধিকারই ছিল না। বাস্তবে দাসমালিক রাষ্ট্রে দাসদের অবস্থার সঙ্গে কৃষকদের অবস্থার খুব সামান্যই পার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের মুক্তির, কৃষকদের মুক্তির পথ খানিকটা প্রশস্ত হয়েছিল, কারণ কৃষক-ভূমিদাসকে জমিদারদের প্রত্যক্ষ সম্পত্তি বলে মনে করা হত না। ভূমিদাসরা কিছুটা সময় নিজের জমিতে কাজ করতে পারত, বলা যায় যে, তার নিজের কিছুটা সত্তা ছিল। বিনিময় ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিদাসত্ব ব্যবস্থা ক্রমাগত ভেঙে পড়তে থাকল এবং কৃষকের মুক্তির সুযোগ ক্রমাগত বাড়তে থাকল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ সব সময়েই দাস-সমাজের চেয়ে বেশি জটিল। ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির অধিকতর উপাদান সেই সমাজে ছিল, যা এমনকি সেই যুগেই সমাজকে পুঁজিবাদের দিকে নিয়ে গেছে। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল। এখানেও রাষ্ট্রের ধরনে পার্থক্য দেখা যেত। রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র দুই-ই দেখা গেছে, যদিও প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকাশ ছিল খুবই দুর্বল। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সামন্তী জমিদারকেই একমাত্র শাসক বলে মনে করা হত। কৃষক-ভূমিদাসরা সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল।

দাসপ্রথা ও সামন্তী প্রথা দুই ব্যবস্থাতেই বলপ্রয়োগ ছাড়া সমাজের একটি নগণ্য সংখ্যালঘু অংশ কখনও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর প্রভুত্ব করতে পারত না। উৎপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য উৎপীড়িতদের অবিরাম প্রচেষ্টার অসংখ্য দৃষ্টান্তে ইতিহাস পূর্ণ। দাস যুগের ইতিহাসে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধের বহু ঘটনা আছে যার কোনও কোনওটি চলেছে কয়েক দশক ধরে। ঘটনাচক্রে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এখন নাম নিয়েছে 'স্পার্টাসিস্ট' বা স্পার্টাকাসপন্থী। এটিই জার্মানির একমাত্র পার্টি যেটি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত লড়াই করছে। এরা এই নাম নিয়েছে কারণ দু'হাজার বছর আগে দাসদের অন্যতম একটি মহাবিদ্রোহের সবচেয়ে খ্যাতনামা নায়কদের অন্যতম ছিলেন স্পার্টাকাস। আপাতদৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান রোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভাবে দাস-প্রথার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র বিপুল দাসবাহিনীর বিরাট অভ্যুত্থান সেই রোমান সাম্রাজ্যের উপর কয়েক বছর ধরে আঘাত হেনেছিল, তাকে নাড়া দিয়েছিল বারবার। শেষে দাসমালিকদের হাতে তারা পরাজিত, বন্দি ও নির্যাতিত হয়। শ্রেণি-সমাজের গোটা ইতিহাস জুড়েই এই ধরনের গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে আছে। আমি দাস যুগের বৃহত্তম গৃহযুদ্ধের উদাহরণটির উল্লেখ করলাম। সামন্তী যুগ জুড়েও একই ভাবে ক্রমাগত কৃষকদের অভ্যুত্থান দেখা গেছে। যেমন ধরুন, মধ্যযুগের জার্মানিতে দুটি শ্রেণির মধ্যে, জমিদার ও ভূমিদাসদের মধ্যে সংগ্রাম ব্যাপক আকার নেয় এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে তা কৃষকদের গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। রাশিয়াতেও সামন্তী জমিদারদের বিরুদ্ধে

বারেবারে কৃষকদের এই রকম অভ্যুত্থানের উদাহরণ আপনাদের জানা আছে।

নিজেদের শাসন কায়েম রাখা ও নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য জমিদারদের এমন একটি যন্ত্রের দরকার ছিল যার সাহায্যে তারা অসংখ্য লোককে নিজের অধীনে একত্রিত রাখতে পারবে আর তাদের উপর কতগুলি বিশেষ আইনকানুন চাপিয়ে দিতে পারবে। এই সমস্ত আইনেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল একটিই— কৃষক-ভূমিদাসদের উপর জমিদারদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা। এবং এই ছিল সামন্তী রাষ্ট্র, ধরুন রাশিয়াতে, কিংবা বেশ অনুন্নত এশীয় দেশগুলিতে, যেখানে আজ পর্যন্ত সামন্তপ্রথা টিকে আছে, এই রাষ্ট্র আলাদা আলাদা চেহারা নিয়েছে— হয় প্রজাতান্ত্রিক কিংবা রাজতান্ত্রিক। সামন্তী সমাজে রাষ্ট্র যখন রাজতান্ত্রিক ধাঁচের, সেখানে একজন ব্যক্তির শাসন মেনে নেওয়া হত। সামন্তী প্রজাতন্ত্রে জমিদার সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যোগদান কিছু না কিছু পরিমাণে মেনে নেওয়া হত। সামন্ততন্ত্রে সমাজ ছিল শ্রেণিবিভক্ত, যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিদাস-কৃষক নগণ্য মুষ্টিমেয় জমির মালিক জমিদারদের সম্পূর্ণ অধীনে থাকত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটল নতুন এক শ্রেণির— পুঁজিপতি শ্রেণি। মধ্যযুগের শেষ দিকে যখন আমেরিকা আবিষ্কারের পর বিশ্ব-বাণিজ্য প্রচুর বেড়ে গেল, যখন মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ বেড়ে গেল, যখন সোনা ও রূপা বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল, যখন মুদ্রা-সঞ্চালনের ফলে এক একজন লোকের হাতে বিপুল সম্পদ থাকা সম্ভব হয়ে উঠল, তখনই পুঁজির উদ্ভব ঘটল। সারা দুনিয়াতেই সোনা ও রূপাকে সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকল। জমিদার শ্রেণির অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল, আর নতুন শ্রেণির— পুঁজির প্রতিনিধিদের ক্ষমতা বাড়তে থাকল। সমাজ-কাঠামো এমন ভাবে পুনর্গঠিত হল, যাতে মনে হল সব নাগরিকই সমান, যেন দাসমালিক ও দাসের মধ্যেকার পুরনো শ্রেণিবিভাগ অদৃশ্য হয়েছে, যেন কার মালিকানায় কত পুঁজি আছে, তার পরিমাণ নির্বিশেষে আইনের চোখে সবাই সমান বলে বিবেচিত হয়েছে, ব্যক্তিগত মালিকানা হিসাবে জমিই থাকুক অথবা কারও ক্ষেত্রে নিজের শ্রম করার ক্ষমতা ছাড়া বেঁচে থাকার জন্য আর কিছুই না থাকুক, আইনের চোখে সবাই সমান। আইন প্রত্যেককে সমানভাবে রক্ষা করে। জনসাধারণ, যাদের কোনও সম্পত্তি নেই, খাটার ক্ষমতা ছাড়া যাদের আর কিছু নেই, ক্রমাগত দরিদ্র ও ধ্বংস হয়ে যেতে যেতে যারা সর্বহারায় পরিণত হয়, তাদের আক্রমণের হাত থেকে সম্পত্তিবানদের সম্পত্তি রক্ষা করে এই আইন। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ।

এ নিয়ে এখন সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। পার্টির কর্মসূচি আলোচনার সময়ে আপনারা পুঁজিবাদী সমাজের বর্ণনা আবার শুনবেন। স্বাধীনতার স্লোগান তুলে ভূমিদাসত্বের বিরুদ্ধে, পুরনো সামন্তী-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিল এ সমাজ। কিন্তু সেই স্বাধীনতা ছিল শুধু সম্পত্তিবানদের স্বাধীনতা। আঠেরো শতকের শেষভাগে ও উনিশ শতকের শুরুতে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল। রাশিয়াতে এই

ঘটনা ঘটেছে অন্য দেশের চেয়ে দেরিতে— ১৮৬১ সালে। সামন্তী রাষ্ট্রের জায়গায় তখন এল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র ঘোষণা করল যে, তার মূল নীতি সব মানুষের স্বাধীনতা। বলল, সমগ্র জনগণের ইচ্ছাকে সে রূপ দিচ্ছে। অস্বীকার করল যে, সে কোনও শ্রেণিরাষ্ট্র। সমাজতন্ত্রীরা যারা সমগ্র জনতার স্বাধীনতার জন্য লড়ছে— তাদের সাথে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংগ্রাম বাধল এখানেই। এই সংগ্রামের পরিণতিতে আজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠেছে এবং এ সংগ্রাম সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে ।

বিশ্ব-পুঁজির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তাকে বুঝতে হলে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মর্মবস্তু বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে, সামন্তী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র লড়াইয়ে এগিয়েছিল স্বাধীনতার পতাকা হাতে নিয়ে। সামন্ততন্ত্র বিলোপের ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা স্বাধীনতা পেল। এতে তাদের উপকার হল। কেন না ভূমিদাসত্ব-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল এবং কৃষকরা জমির পুরোপুরি মালিক হওয়ার সুযোগ পেল। এই জমি তারা জমিদারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাকা দিয়ে কিনেছিল, নাকি জমিদারকে টাকা দিয়ে বিশেষ খাজনায় বেগার খাটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার ফলে তারা জমি পেয়েছিল— তা নিয়ে রাষ্ট্র মাথা ঘামাত না। সম্পত্তি যে ভাবেই অর্জিত হোক না কেন, রাষ্ট্র তা রক্ষা করত। কারণ রাষ্ট্রের ভিত্তিই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা। সমস্ত আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রেই কৃষকেরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হয়ে দাঁড়াল। এমনকি জমিদার যখন তার জমির কিছুটা কৃষকের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তখনও রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করেছে— জমিদারকে দিয়েছে ক্ষতিপূরণ বা জমি বিক্রির টাকা। রাষ্ট্র যেন ঘোষণা করল যে, সে পুরোপুরিভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করবে এবং সব রকমে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা ও সমর্থন করবে। রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কারখানা-মালিকের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার মেনে নিল। আর ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজির জোর এবং সম্পত্তিহীন শ্রমিক ও মেহনতি কৃষকদের পুরোপুরি ভাবে অধীনে রাখার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ ঘোষণা করল যে, স্বাধীনতাই তার শাসনের ভিত্তি। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে এই সমাজ মালিকানার স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং রাষ্ট্র যেন আর এখন শ্রেণিরাষ্ট্র নয়— এই কথায় বিশেষ গর্ব অনুভব করল।

তবুও রাষ্ট্র গরিব চাষি ও শ্রমিক শ্রেণিকে অধীনে রাখার জন্য পুঁজিপতিদের হাতের যন্ত্র হয়েই রইল। কিন্তু বাইরের চেহারায় মনে হত এ রাষ্ট্র মুক্ত। সর্বজনীন ভোটাধিকার ঘোষণা করল রাষ্ট্র। নিজের সমর্থক, প্রচারক, পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করাল যে, এ রাষ্ট্র শ্রেণিরাষ্ট্র নয়। এমনকি এখনও, যখন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে তখনও তারা অভিযোগ আনে যে, আমরা নাকি ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করছি। বল প্রয়োগের ভিত্তিতে, এক দল লোকের উপরে আর এক দল লোকের নিপীড়নের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছি আমরা, যেখানে তাদের রাষ্ট্র হল জনতার গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্র। আজ যখন বিশ্বজোড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়েছে, বিপ্লব যখন কয়েকটি দেশে জয়ী হয়েছে, যখন বিশ্ব-পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই বিশেষ ভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে রাষ্ট্রের প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলা চলে যে, আজকের দিনের সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন এটি, আজকের দিনের সব রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সব রাজনৈতিক বিরোধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি।

রাশিয়া বা তুলনায় আরও বেশি সভ্য যে কোনও দেশের যে কোনও রাজনৈতিক দলের কথা ধরলেই দেখা যায় যে, এখন সব রাজনৈতিক বিতর্ক, মতভেদ ও মতামত রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণাকে কেন্দ্র করেই। কোনও পুঁজিবাদী দেশে, কোনও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে— বিশেষ করে সুইজারল্যান্ড বা আমেরিকার মতো সবচেয়ে স্বাধীন কোনও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্র কি জনগণের ইচ্ছা, সমগ্র জনতার সাধারণ সিদ্ধান্ত, জাতীয় কামনা ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি, নাকি রাষ্ট্র হল শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সম্প্রদায়ের উপর সে দেশের পুঁজিপতিদের শাসন বজায় রাখার যন্ত্র? সারা পৃথিবী জুড়ে সব রাজনৈতিক বিতর্ক আজ এই মূল প্রশ্নটিকে ঘিরেই। বলশেভিকবাদ বিষয়ে ওরা কী বলে? বুর্জোয়া সংবাদপত্র বলশেভিকদের গালাগালি দেয়। বলশেভিকরা গণতন্ত্র খর্ব করেছে— এই বস্তাপচা অভিযোগ আওড়ায়নি এমন একটি কাগজও আপনারা পাবেন না। মনের সারল্যবশত (হয়তো আসলে সারল্যবশে নয় বা প্রবাদে যে বলে— এক ধরনের সারল্য চুরির চেয়েও যা খারাপ, সেই রকম সারল্য) যদি আমাদের মেনশেভিকরা ও সোসালিস্ট রেভলিউশনারিরা মনে করে তারাই বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আবিষ্কার করেছে যে, বলশেভিকরা স্বাধীনতা ও জনতার শাসন খর্ব করেছে, তা হলে তারা খুবই হাস্যকর রকমের ভুল করেছে। আজকের দিনে সবচেয়ে ধনী দেশের সবচেয়ে ধনী যে কাগজগুলি কোটি কোটি টাকা খরচ করে, কোটি কোটি কপি কাগজ ছেপে বুর্জোয়াদের মিথ্যা কথা ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির কথা ছড়ায়, তাদের মধ্যে এমন একটি কাগজও নেই, যেখানে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে এই মূল যুক্তি ও অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি যে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড হল জনতার শাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উন্নত রাষ্ট্র আর বলশেভিক প্রজাতন্ত্র হল ডাকাতদের রাষ্ট্র, সেখানে কোনও স্বাধীনতা নেই, বলশেভিকরা জনতার শাসনের নীতি খর্ব করেছে, এমনকি সংবিধান সভাও ভেঙে দিয়েছে। গোটা দুনিয়া জুড়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে এই সব মারাত্মক অভিযোগ আওড়ানো হয়। এই সমস্ত অভিযোগ সরাসরিভাবে আমাদের যে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, তা হল— রাষ্ট্র কী? এই সব অভিযোগ বুঝতে হলে, পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার সাথে এগুলিকে খুঁটিয়ে দেখে বিচার করতে হলে, জনশ্রুতির ভিত্তিতে এগুলিকে যাচাই করার বদলে, নিজেদের দৃঢ় মতামতের সাহায্যে যাচাই করতে হলে, রাষ্ট্রী কী, সে সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। আমাদের সামনে রয়েছে নানা ধরনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তার সমর্থনে রয়েছে নানা কিসিমের তত্ত্ব যা মহাযুদ্ধের আগে তৈরি হয়েছে। প্রশ্নটির সঠিক জবাব দিতে হলে, এই

সমস্ত তত্ত্ব ও মতামত আমাদের খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে।

এঙ্গেলসের লেখা 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইটির সাহায্য নেওয়ার কথা আমি আপনাদের আগেই বলেছি। এই বইয়েই বলা হয়েছে, যে রাষ্ট্রে জমি ও উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, যেখানে পুঁজির প্রভুত্ব আছে, যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, সে রাষ্ট্র হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। সে হল শ্রমিক শ্রেণি ও গরিব কৃষককে পুঁজিপতিদের আয়ত্তাধীনে রাখার যন্ত্র। সর্বজনীন ভোটাধিকার, সংবিধান সভা, পার্লামেন্ট— এ সব হল শুধু একটা ঠাট, এক ধরনের প্রতিশ্রুতিপত্র, এতে আসল ব্যাপারটার কিছু রদবদল হয় না।

রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের নানা ধাঁচ হতে পারে। কিন্তু আসলে ক্ষমতা পুঁজির হাতেই থেকে যায়, সেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার থাক বা না থাক, সে প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক হোক বা না হোক। আসলে প্রজাতন্ত্র যত বেশি গণতান্ত্রিক হয় পুঁজিবাদের আধিপত্য ততই অমার্জিত ও নিষ্ঠুর রূপে ফুটে ওঠে। দুনিয়াতে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির একটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবু আর কোথাও পুঁজির কর্তৃত্ব, সারা সমাজের উপর মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতির আধিপত্য আমেরিকার মতো এত নগ্ন ও এত খোলাখুলি দুর্নীতিপরায়ণ রূপ নেয়নি (১৯০৫ সালের পর যারা সেখানে থেকেছে তারা নিশ্চয় এ কথা জানে)। পুঁজির অস্তিত্ব থাকলেই তা সারা সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং কোনও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা কোনও ধরনের ভোটাধিকারই তার মূল চরিত্র পাল্টাতে পারে না।

সামন্ততন্ত্রের তুলনায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল এক বিরাট প্রগতিশীল অগ্রগতি। এগুলির মাধ্যমে সর্বহারাদের বর্তমান ঐক্য ও সংহতি, তাদের যে দৃঢ়বদ্ধ সুশৃঙ্খল বাহিনী পুঁজির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালাচ্ছে, তা গড়া সম্ভব হয়েছে। দাসদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, কৃষক-ভূমিদাসদের লড়াইও এর কাছাকাছি ছিল না। আমরা জানি, দাসরা বিদ্রোহ করেছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছে, গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে। কিন্তু তারা কখনও এমন সচেতন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে পারেনি যারা তাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে। নিজেদের লক্ষ্য তারা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারেনি। এমনকি ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক মুহূর্তেও তারা চিরকাল শাসক শ্রেণির হাতের ঘুঁটি হয়েই থেকে গেছে। বিশ্বজোড়া সামাজিক ক্রমবিকাশের দিক থেকে দেখলে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, পার্লামেন্ট, সর্বজনীন ভোটাধিকার— সবই বিরাট অগ্রগতির পরিচয় দেয়। মানুষ পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে গেছে। একমাত্র পুঁজিবাদের ফলেই, শহর-সভ্যতার কল্যাণে উৎপীড়িত সর্বহারা শ্রেণি নিজেকে চিনতে পেরেছে এবং দুনিয়াজোড়া শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সারা পৃথিবী জুড়ে লাখ লাখ শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করে গড়ে তুলেছে রাজনৈতিক দলগুলি— সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক পার্টি, যারা জনতার সংগ্রামে সচেতন নেতৃত্ব দিচ্ছে। সংসদীয় ব্যবস্থা ছাড়া, নির্বাচন-ব্যবস্থা ছাড়া শ্রমিক শ্রেণির এ অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। সেই জন্য সাধারণ মানুষের চোখে এ সব

জিনিসের গুরুত্ব এত বেশি হয়ে উঠেছে। সেই জন্যই মৌলিক পরিবর্তনকে এত কঠিন বলে মনে হয়। রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সবার স্বার্থরক্ষাই তার উদ্দেশ্য— এই বুর্জোয়া মিথ্যাটা যে শুধু জ্ঞানপাপীরা, বিজ্ঞানী, ধর্মযাজকরাই আঁকড়ে ধরে ও সমর্থন করে তা নয়, অনেক লোক, যারা মনেপ্রাণে পুরনো কুসংস্কারে বিশ্বাস করে এবং যারা পুরনো পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর বুঝতে পারে না, তারাও তাই করে। শুধু বুর্জোয়া শ্রেণির উপর সরাসরি ভাবে নির্ভরশীল মানুষরা নয়, পুঁজির জোয়ালে নিপীড়িত যারা, বা যারা পুঁজির কাছে ঘুষ খেয়েছে (নানা ধরনের বিপুল সংখ্যায় বিজ্ঞানী, শিল্পী, ধর্মযাজক ইত্যাদি যারা পুঁজির সেবায় নিযুক্ত) শুধু তারা নয়, এমনকি সাধারণ মানুষ, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা যাদের কুসংস্কারের মতো পেয়ে বসেছে, তারাও সারা দুনিয়া জুড়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে। কারণ প্রতিষ্ঠা লগ্নেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়াদের এই মিথ্যে কথাগুলো অস্বীকার করে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল— আপনারা বলেন যে, আপনাদের রাষ্ট্র স্বাধীন, কিন্তু আসলে, যত দিন ব্যক্তিগত মালিকানা আছে, তত দিন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলেও রাষ্ট্র আসলে শ্রমিকদের দমন করার জন্য পুঁজিবাদীদের হাতের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। আর সে রাষ্ট্র যত বেশি স্বাধীন, তার দমনমূলক চরিত্রটিও ততই প্রকট। এর উদাহরণ হল ইউরোপে সুইজারল্যান্ড আর আমেরিকা মহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ দেশ দুটো যদিও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, কিন্তু যতই পালিশ চড়িয়ে এদের সুন্দর করে দেখানো হোক, গণতন্ত্র ও জনগণের সমানাধিকারের কথা যত জোর গলায় বলা হোক, তা সত্ত্বেও, পুঁজি আর কোথাও এখানকার মতো এত খোলাখুলি, এত নির্মম শাসন চালায় না। আসল কথা হল, সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকায় পুঁজিই আধিপত্য করে এবং শ্রমিকরা তাদের অবস্থার সত্যিকারের উন্নতির সামান্য চেষ্টা করলেই তার জবাব হয় গৃহযুদ্ধ। এ দুটি দেশে সৈন্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীও ছোট— সুইজারল্যান্ডে মিলিশিয়া আছে এবং প্রত্যেক সুইস নাগরিকের বাড়িতে বন্দুক আছে। এ দিকে অল্প কিছু দিন আগে পর্যন্তও আমেরিকায় কোনও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না। তাই ধর্মঘট হলেই বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করে, ভাড়াটে সৈন্যদের দিয়ে ধর্মঘট দমন করে। আর কোথাও সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকার মতো এত তীব্র নির্মমতার সাথে শ্রমিক আন্দোলন দমন করা হয় না। আর কোথাও পার্লামেন্টে পুঁজির প্রভাব এ দেশ দুটির মতো এত প্রবল নয়। পুঁজির জোরই আসলে সব, স্টক এক্সচেঞ্জই সব, আর পার্লামেন্ট ও নির্বাচন হল শুধু ফাঁকা ঠাট, ঠুনকো মাটির পুতুল। কিন্তু দিনে দিনে শ্রমিকদের চোখ ফুটছে এবং বিশেষ করে সাম্প্রতিক হত্যালীলার পর সোভিয়েত রাজের ধারণা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠছে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালানো যে জরুরি, দিনে দিনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে শ্রমিক শ্রেণির কাছে।

প্রজাতন্ত্রের খোলসটা যাই হোক না কেন, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলেও যদি সেটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হয়, যদি জমি ও কল-কারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা

বজায় থাকে এবং ব্যক্তিগত পুঁজি গোটা সমাজকে মজুরি-দাস বানিয়ে ফেলে, অর্থাৎ যদি আমাদের পার্টির কর্মসূচি ও সোভিয়েত সংবিধানের ঘোষিত নীতিগুলি সেখানে কার্যকর করা না হয়— তবে সেই রাষ্ট্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠ একদল মানুষের উপর মুষ্টিমেয় মানুষের আধিপত্য চাপিয়ে রাখার দমনমূলক হাতিয়ার। আমরা সেই রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে এমন একটি শ্রেণির হাতে দেব, যারা পুঁজির সর্বময় ক্ষমতার অবসান ঘটাবে। রাষ্ট্রের সার্বজনীন সমতা বিষয়ে পুরনো সব কুসংস্কার আমরা উড়িয়ে দেব, কারণ এ সবই শুধু ভাঁওতা। যত দিন সমাজে শোষণ থাকে, তত দিন সমতা আসতে পারে না। জমিদার ও মজুর সমান হতে পারে না, ভুখা মানুষ ও ভরপেট মানুষ সমান হতে পারে না। রাষ্ট্র মানে জনগণের শাসন— এই পুরনো আষাঢ়ে গল্পে বিশ্বাস করে রাষ্ট্র নামের যে যন্ত্রটাকে লোকে কুসংস্কার ও ভয় মেশানো শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে মেনে নিত, সর্বহারা শ্রেণি সেই যন্ত্রটিকে পরিত্যাগ করে ঘোষণা করে— এ হল বুর্জোয়া মিথ্যাচার। পুঁজিপতিদের হাত থেকে এ যন্ত্র ছিনিয়ে নিজের হাতে তুলে নিয়েছি আমরা। ওই যন্ত্র বা মুণ্ডরের সাহায্যেই আমরা সব শোষণ খতম করব। এবং যখন দুনিয়ার কোথাও আর শোষণের সম্ভাবনা থাকবে না, যখন জমির মালিক ও কারখানার মালিক বলে কেউ থাকবে না, কেউ ভুরিভোজন করে আর কেউ উপোস করে, এ অবস্থা যখন আর থাকবে না— এ সবের সম্ভাবনা যখন আর থাকবে না, একমাত্র তখনই আমরা এ যন্ত্রটিকে বাতিল করে ছাইগাদায় ফেলে দিতে পারব। তখন আর রাষ্ট্র থাকবে না, শোষণও থাকবে না। এই হল আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি। আশা করি পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে আমরা এই প্রশ্নে ফিরে আসব এবং বারবারই ফিরে আসব।